চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা
(Buddhist Ethics)

পঞ্চশীল ও অহিংসা

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৌদ্ধদর্শন একটি নাস্তিকদর্শন নামে পরিচিত। অপর একটি নাস্তিক দর্শন জৈনদের মতো বৌদ্ধদর্শনও বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে না। বৌদ্ধ ও জৈন এই দুটি দর্শন প্রায় সমসাময়িক। নাস্তিকতা ছাড়াও এই দুটি দর্শনে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তা হল অহিংসা। ইহলৌকিক জীবন সম্বন্ধে উভয় দর্শনে নৈরাশ্যবাদ প্রকট হয়েছিল এবং স্বভাবতই এই দুটি সম্প্রদায় জাগতিক দুঃখ ও নৈরাশ্য থেকে মুক্তি লাভের পথের সন্ধান করেছিলেন— যদিও মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অভিন্ন নয়। কিন্তু উভয় দর্শনেই জীবনকে পরিচালনা করার দিক্‌নির্দেশ করা হয়েছে। এই নির্দেশের মধ্যেই আমরা জৈন ও বৌদ্ধ নীতিদর্শনের সন্ধান পাই।

বুদ্ধদেবের নীতিদর্শনের কোন লিখিত বিবরণ ছিল না। বুদ্ধের দেহত্যাগের বহু বছর পরে সন্ন্যাসীরা তাঁর নীতিদার্শনিক আলোচনাকে লিপিবদ্ধ করেন। বিনয়-পিটক, সুত্ত-পিটক ও অভিধর্ম-পিটক নামক তিনটি গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক আচরণের বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব যদিও তাঁর নীতিদর্শনকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেননি তাহলেও বিভিন্ন 'পিটকে' বিভিন্ন নৈতিক সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা যায়। এই আলোচনায় আমরা দেখি যে বুদ্ধদেবের কাছে নীতিদর্শন একটি জীবনযাত্রা প্রণালী এবং একই সঙ্গে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের একটি নৈতিক উপায়।

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নীতিদর্শন তাদের অধিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে অধিবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি কারণ সেই সময়ে বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ এবং তার থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় অনুসন্ধান করতেই সচেষ্ট ছিলেন। বুদ্ধদেব যে তত্ত্ব বা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তা নয়। তিনি মনে করেছিলেন যে জীবনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তিনি তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ নন। তবে তিনি জানেন যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, দুঃখের অবসান হয় না অথবা শান্তি বা নির্বাণ লাভ হয় না। মানুষের দুঃখে তিনি এতই বিচলিত বোধ করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে গৃহে আবদ্ধ থাকা সম্ভব হয়নি।

বুদ্ধদেবের পরবর্তী উপদেশসমূহ বিচার করলে একথা মনে হয় না যে তাঁর কোন অধিবিদ্যা ছিল না। আমরা বৌদ্ধদর্শনে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, মোক্ষ প্রভৃতি সমস্ত ধারণারই সাক্ষাৎ পাই। এই সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে কর্মবাদ তাঁর নীতিদর্শনের পক্ষে সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক। একটি শাশ্বত নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাস ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কর্মবাদ এইরকম একটি তত্ত্ব।

কর্মবাদ

কর্মবাদ স্বীকার করার কারণ কি?— বৌদ্ধ রচনা সংগ্রহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রধানত জগতে মানুষের বিভিন্নতা বিবেচনা করে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে। মিলিন্দা পণ্হতে নাগসেনের একটি উক্তিতে মানুষে মানুষে এই ভেদের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখি যে কোন মানুষ স্বল্পায়ু, আবার কোন মানুষ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী; কোন মানুষ স্বাস্থ্যবান আবার অন্যে ভগ্নস্বাস্থ্য, কোন মানুষ সুন্দর আবার কেউ কুৎসিৎ, কেউ শক্তিমান আবার কেউ দুর্বল, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ। বর্তমান জীবনকে বিচার করলে এই বিভিন্নতার কোন কারণ পাওয়া যায় না। তাই অতীত কর্মকেই এই বিভিন্নতার কারণ বলে স্বীকার করা হয়। মানুষ যে রকম কর্ম করে সেই রকম ফল ভোগ করে। সৎ কর্ম শুভ ফল প্রদান করে; অসৎ কর্ম অশুভ ফল দেয়। কর্মের নিয়ম অমোঘ। কৃতকর্ম থেকে কোন মানুষই মুক্তি লাভ করতে পারে না। মানুষের সমস্ত কর্মই তৎক্ষণাৎ ফল দান করে না। কর্ম ভবিষ্যতে ফল দান করার জন্য সঞ্চিত থাকতে পারে। এই সঞ্চিত কর্ম ইহজন্মে বা পরজন্মেও ফল দান করতে পারে।

সকাম কর্মই ফলদান করে— বৌদ্ধগণ সকাম কর্মকেই ফলপ্রসূ বলে স্বীকার করেছেন। যে কর্মে ফল লাভের প্রত্যাশা বা কামনা আছে একমাত্র সেই কর্মই এই জীবনে বা পরজীবনে ফল প্রধান করে। যে কর্ম কামনা বা আসক্তি রহিত সেই কর্ম যেন সমূলে ছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনও ভবিষ্যতে ফল প্রদান করে না। বুদ্ধদেব বলেছেন যে, আগুনে দগ্ধ বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর জন্মে না সেইরকম নিরাসক্ত কর্মও কোন ফল উৎপাদন করে না। মহাসতি পথান সূত্রেও বলা হয়েছে যে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে সুখকর বলে কামনা করি। আমাদের বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে এইসব সুখকর বস্তুর কামনা যুক্ত থাকে। এই কামনার ফলে দুঃখ হয়। আবার কামনা বা মোহের অবসানে দুঃখেরও অবসান হয়। যখন এই কামনা বা তৃষ্ণার অবসান হয় তখন জীব অর্হতে পরিণত হয় এবং তখন তার কর্ম কোন ফল প্রদান করে না। অর্হতের কর্ম ভাল বা মন্দ কোন প্রকার ফলই দান করে না, কারণ কামনাই কর্মকে ফলপ্রসূ করে। একজন অর্হৎ পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে পারে। কিন্তু তার বর্তমান জন্মের কর্ম নিষ্কাম বলে কোন ফল উৎপাদন করে না।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম— বৌদ্ধ দর্শনে তিনপ্রকার কর্মের উল্লেখ আছে— কায়িক, বাচিক ও মানসিক। কোন ব্যক্তি যদি প্রাণী হত্যার সংকল্প করে বনে গমন করে কিন্তু দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরেও যদি যে বধ করার যোগ্য কোন প্রাণী না পায় তাহলে সে হয়তো শারীরিকভাবে প্রাণী হিংসা করে না, কিন্তু তার মানসিক কর্মে হিংসা যুক্ত থাকে। এইভাবে যদি কোন ব্যক্তি প্রাণী হত্যার আদেশ দেয় তাহলে তার বাচিক কর্ম হিংসাযুক্ত হবে। তবে একথা সত্য যে, সমস্ত বাচিক ও কায়িক কর্মের মূলে মানসিক কর্ম বর্তমান থাকে। মানসিক কর্ম না থাকলে বাচিক বা কায়িক কর্মও থাকতে পারে না। ফলের কথা বিবেচনা করে কর্মকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়—

(১) অসৎ কর্ম যা অবিশুদ্ধ কর্মফল প্রদান করে।

(২) সৎ কর্ম যা বিশুদ্ধ কর্মফল প্রদান করে।

(৩) আংশিকভাবে সৎ ও আংশিকভাবে অসৎ কর্ম যা শুভ-অশুভ ফল প্রদান করে।

(৪) যে কর্ম সৎ বা অসৎ নয় এবং যা শুভ ও অশুভ কোন রকম ফলই প্রদান করে না; এইরূপ কর্মের দ্বারা কর্মেরই ক্ষয় হয়।

কোন কোন দর্শনে বলা হয়েছে যে, কর্মনিয়ম ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর কর্মনিয়ম অনুযায়ী জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই মতে জীবের কর্ম যেহেতু অচেতন তাই চেতন ঈশ্বরের পরিচালনা ছাড়া এই কর্ম ফল প্রদান করতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় যে কর্মনিয়ম

স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কার্যকর হতে পারে। কর্ম ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ফল প্রদান করে।

বৌদ্ধ নীতিদর্শন

বহু বিষয় সম্পর্কে বুদ্ধদেব শিষ্যদের উপদেশ দানে বিরত থাকতেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে এই সমস্ত বিষয়ের ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা নেই। জগতের নিত্যতা বা অনিত্যতা, আত্মার অমরতা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অনীহা ছিল কারণ দুঃখক্লিষ্ট মানুষের জীবনযন্ত্রণা তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। অধিবিদ্যার আলোচনা মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ দেখায় না। বুদ্ধদেব বলেছেন জগৎকে নিত্য বা অনিত্য বলে জানালেও মানুষের ব্যধি, বার্ধক্য ও মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যায় না। সমস্ত দুঃখকে প্রতিহত করার জন্য একটি পথেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যার নাম 'নির্বাণ'।

বুদ্ধদেব যদিও অধিবিদ্যার তুলনায় দুঃখ মুক্তিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলেন তাহলেও তাঁর নীতিদর্শনের ভিত্তিতে যে অধিবিদ্যা ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। আসলে ভারতীয় দর্শনে নীতিদর্শন কখনই অধিবিদ্যা নিরপেক্ষ নয়। বুদ্ধদেব কর্মবাদ স্বীকার করেছিলেন, নির্বাণের সম্ভাবনা স্বীকার করেছিলেন। এই সমস্ত ধারণাই পরাতাত্ত্বিক অর্থাৎ অধিবিদ্যার ধারণা। জগতের অনিত্যতা বা তার ক্ষণিকত্ব, প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব, আর্যসত্য প্রভৃতি সমস্তই বৌদ্ধ অধিবিদ্যার অঙ্গ। বৌদ্ধ নীতিদর্শন এই সমস্ত তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল।

বৌদ্ধ নীতিদর্শনের একটি বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে। এই নীতিদর্শনই মানুষ ও সমাজকে চরিত্রবান করে তুলতে পারে। এই নীতিদর্শনে একদিকে যেমন মানবিকতা ও জনকল্যাণের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে সেইরকম অপরদিকে একটি ন্যায়সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে একটি নৈতিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। সেই পথই বৌদ্ধ মতে নৈতিক যা নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের নৈতিক পথ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য। এই দিক থেকে বৌদ্ধ নীতিদর্শনে যেন নৈতিকতার নিরঙ্কুশ মূল্য নেই বলেই মনে হয়। একমাত্র নির্বাণ বা মোক্ষের নিরঙ্কুশ মূল্য আছে।

কিন্তু বুদ্ধদেব যে সামাজিক নীতিদর্শনের কথা বলেছেন সেখানে সমাজবদ্ধ মানুষের নৈতিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে বৌদ্ধদর্শনে সমাজের ধারণাটি লক্ষ্য করা আবশ্যক। বৌদ্ধ দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী নিয়েই আমাদের সমাজ অর্থাৎ

সমাজ শুধু মানুষকে নিয়েই গড়ে ওঠে না। সমাজ গড়ে ওঠে পশুপাখি এবং সমস্ত প্রাণীজগৎকে নিয়ে। আমাদের আচরণের নৈতিক উৎকর্ষতা নির্ধারিত হয় সমস্ত প্রাণীর প্রতি আমাদের ব্যবহারের নিরিখে।

বৌদ্ধ নীতিদর্শন কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি যে মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু বুদ্ধদেবকে বিচলিত করেছিল। তিনি দেখেছিলেন যে জীবন ও জগৎ সতত পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। ক্ষণিকবাদ বা অনিত্যবাদ বৌদ্ধদর্শনের দুটি মুখ্য তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই বুদ্ধদেবের নীতিদর্শন গড়ে উঠেছে। জীবন অনিত্য বলেই দুঃখময় এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্যই বুদ্ধদেব তাঁর নীতিদর্শন রচনা করেন।

ধর্মই বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা, যে ব্যক্তি ধর্ম পালন করেন তিনি দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের অধিকারী হন। জগৎ ও জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, সুখও যেহেতু পরিণামে দুঃখ উৎপাদন করে তাই আসক্তি পরিত্যাগ করে নিরাসক্তির সাধনা করা কর্তব্য। বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান মানুষের সকল দুঃখের কারণ। তাই অজ্ঞানের বিনাশের জন্য নিরাসক্তির সাধনা বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার মূলকথা বলে স্বীকার করা হয়েছে। নিরাসক্তির এই সাধনার লক্ষ্য হল বোধিসত্ত্ব লাভ। বৌদ্ধদর্শনে তাঁকেই বোধিসত্ত্ব বলা হয়েছে যিনি অহংবোধকে বিসর্জন দিতে সমর্থ হয়েছেন এবং যিনি ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতিকে অতিক্রম করে দয়া, মমতা, মৈত্রী প্রভৃতি ধর্মলাভ করেন। বৌদ্ধনীতিদর্শন মানুষকে ধর্মীয় উৎকর্ষতার পথে নিয়ে যায়। সুখ ও দুঃখ, শৈত্য ও উষ্ণতা, আনন্দ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষতির উর্ধ্বে গমন করে মানুষ এই উৎকর্ষতা লাভ করে। বোধিসত্ত্বের ধারণা তাই গীতায় কথিত স্থিতপ্রজ্ঞের ধারণার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়। উভয়ক্ষেত্রেই নৈতিক আদর্শটি পরাতাত্ত্বিক আদর্শে মিশে গিয়েছে।

এই সমস্ত কথাই চারটি আর্যসত্যের মধ্যে কথিত হয়েছে। এই চারটি আর্যসত্যের মধ্যেই বুদ্ধদেবের মূল বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। আর্যসত্যগুলিকে বৌদ্ধ দর্শনের সারমর্ম বলা হয়। তাই চারটি আর্যসত্য এবং বৌদ্ধ বিশ্বচিন্তাকে না বুঝলে বৌদ্ধ নীতিদর্শনও বোঝা যায় না।

বৌদ্ধদর্শনের উদ্ভব ও উদ্দেশ্যের মূলকথা চারটি আর্যসত্যে নিহিত আছে। প্রথম আর্যসত্যে বলা হয়েছে জগৎ ও জীবন দুঃখময়। এই উপলব্ধি থেকে বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তির পথ বা উপায় আবিষ্কারের মাধ্যমে তার পরিণতি। চারটি আর্যসত্যে একথাই বলা হয়েছে।

দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং এই নিবৃত্তি বা নির্বাণই জীবনের পরমলক্ষ্য। এইভাবে বুদ্ধদেব তত্ত্বজ্ঞানকে দার্শনিক বিচারের বিষয় হিসাবে আবদ্ধ না রেখে তাকে মানুষের জীবনে পরিব্যাপ্ত করেন। দার্শনিক সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই

বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য ছিল। দর্শন তাঁর কাছে জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছিল। জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে তার নীতিদর্শন গড়ে ওঠে। প্রথম আর্যসত্যে জগতে দুঃখের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আর্যসত্যে বলা হয়েছে যে দুঃখের কারণ আছে। তৃতীয় আর্যসত্যে বলা হয়েছে যে এই দুঃখকে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। চতুর্থ আর্যসত্যে বলা হয়েছে যে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় আছে। জন্ম বা উৎপত্তি, ক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কারণ হয়। আমাদের মন জগতের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় বলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখের কারণ আবার অপর একটি কারণের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এইভাবে দুঃখের একটি কারণ শৃঙ্খল রচিত হয়। যদি এই কারণশৃঙ্খল ভাঙা যায় তাহলে মানুষ তৎক্ষণাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে।

প্রথম আর্যসত্য— দুঃখ সত্য অর্থাৎ দুঃখ আছে। জগৎ ও জীবন দুঃখময়— এই উপলব্ধি থেকে অন্যান্য অনেক দর্শন সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধদর্শনেরও সূত্রপাত হয়েছে। জগৎ সম্পর্কে যে বিষয়টি মৌলিক সত্য বলে সকল মানুষের কাছে প্রকাশিত হয় তা এই যে দুঃখ আছে। জগতের সবই দুঃখময়। মানুষের জন্ম আছে তাই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু আছে। আসলে জীবনে কিছুই স্থায়ী নয়। যার স্থায়িত্ব নেই তা কখনও নিত্যসুখ উৎপাদন করতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি দুঃখময় একথা প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছে। জীবন মৃৎকুম্ভের মতো ক্ষণ-ভঙ্গুর। মৃত্যু জলপ্লাবনের মতো মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জীবন তাই মরীচিকার মতো মিথ্যা। যা সুন্দর তার থেকে বিচ্ছেদ যেমন দুঃখের সেইরকম বা অসুন্দর তার সঙ্গে মিলনও দুঃখের জন্ম দেয়। যে কোন আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হলেই আমরা দুঃখ বোধ করি। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন বিষয় সুখকর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরিণামে তা দুঃখের জনক হয়। জগতে এমন কোন মানুষ নেই যে সম্পূর্ণভাবে দুঃখমুক্ত। এমন কোন মানুষ নেই যে জীবনে কখন জরা বা ব্যাধি কবলিত হয়নি, বা যে মৃত্যুকে জয় করতে সক্ষম। ধম্মপদে বুদ্ধদেব বলেছেন যে আকাশে, কিংবা সমুদ্রের গভীরে বা পর্বতের গুহায় বিশ্বে এমন কোন স্থান নেই যেখানে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। সুতরাং দুঃখের অনিবার্যতা বৌদ্ধদর্শনের প্রথম ও প্রধান কথা।

দ্বিতীয় আর্যসত্য— সমুদায় সত্য অর্থাৎ দুঃখের কারণ আছে। বৌদ্ধমতে প্রত্যেক বস্তুরই কারণ থাকে। দুঃখ যেহেতু মিথ্যা নয় তাই দুঃখেরও কারণ অবশ্যই থাকবে। দ্বিতীয় আর্যসত্যে বুদ্ধদেব দুঃখের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন।

বৌদ্ধদর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের সাহায্যে দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'কারণ সহযোগে উৎপত্তি'। প্রতিটি

বস্তুই কোন না কোন কারণ সহযোগে উৎপন্ন হয়। কারণ ছাড়া কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। আমরা জানি দুঃখ থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করাই বুদ্ধদেবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য দুঃখের কারণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আবার সেই কারণকে দূর করার জন্য তারও কারণকে জানা প্রয়োজন। দুঃখের উৎপত্তির এই কারণ পরম্পরাকেই প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হয়েছে। বৌদ্ধমতে দুঃখের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বারোটি কারণ আছে— জরামরণ-জাতি-ভব-উপাদন-তৃষ্ণা-বেদনা-স্পর্শ-ষড়ায়তন-নামরূপ-বিজ্ঞান-সংস্কার-অবিদ্যা।

জীব জন্মগ্রহণ করে বলেই সে জরা ও মরণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। জীবের জন্ম না হলে তার দুঃখ বা মৃত্যুও হয় না। জন্ম আছে বলেই দুঃখ, ব্যাধি ও মৃত্যু আছে। জন্মের কারণ কি? ভব বা জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা বা ব্যাকুলতা আছে বলেই জীবের জন্ম হয়। এই ব্যাকুলতার কারণ হল আসক্তি, জাগতিক বিষয়ের প্রতি প্রবল অনুরাগ বা উপাদান থাকার জন্য জন্মগ্রহণ করার ব্যাকুলতা হয়। বিষয়ের প্রতি অনুরাগ হয় তার কারণ বিষয় ভোগের বাসনা বা তৃষ্ণা আছে। বেদনা বা অনুভূতির ফলেই বাসনা জন্মে। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলেই অনুভূতি জন্মে। ষড়ায়তন বা ছটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। এই সংযোগের ফলেই বেদনা বা সুখের অনুভূতি জন্মে। সুতরাং জীবের ছটি ইন্দ্রিয় বা ষড়ায়তন স্পর্শের কারণ। এই ষড়ায়তন কার্যকর হয় কারণ নামরূপ বা দেহ-মনের একটি সংগঠন আছে। এই নামরূপের উৎপত্তি হয় চেতনার ফলে। চেতনা বা বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ করলে নামরূপের সমাহাররূপে জীবদেহের উৎপত্তি হয়। যতদিন জীবদেহ থাকে ততদিন চেতনা দেহকে পরিত্যাগ করে না। চেতনা ব্যতীত জীবদেহের আবির্ভাব, বৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। বিগত জন্মের সংস্কার বর্তমান জন্মের চেতনা উৎপন্ন করে। পূর্বজন্মের সংস্কার চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়। আবার সংস্কার উৎপন্ন হয় অবিদ্যাজনিত আসক্তি বা কামনার ফলে। অবিদ্যার অর্থ সম্যকজ্ঞানের অভাব। যা অসত্য তার প্রতি আকর্ষণই অবিদ্যার ফল। অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ জীবনের সকল দুঃখ সত্ত্বেও তার প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে।

সুতরাং অবিদ্যা বা সম্যক জ্ঞানের অভাববশত জগতের প্রতি আসক্তি জন্মে, আসক্তির ফলে সংস্কার উৎপন্ন হয়। অতীত জন্মের যাবতীয় কর্ম সংস্কার বর্তমান জন্মের চেতনা উৎপন্ন করে। চেতনা থেকে যথাক্রমে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা উৎপন্ন হয়। বেদনা বা অনুভূতির ফলে বিষয়ভোগের বাসনা বা তৃষ্ণা জন্মে। ভোগস্পৃহা বা তৃষ্ণার ফলে আসক্তি বা উপাদানের জন্ম হয়। আসক্তি থেকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করার ব্যাকুলতা আসে যার নাম 'ভব'। এই 'ভব' বা ব্যাকুলতার ফলে জন্ম হয়। জন্মই জরা-মরণ বা বিভিন্ন প্রকার দুঃখের কারণ হয়।

তৃতীয় আর্যসত্য— নিরোধ সত্য। দুঃখ ও জরামরণ কারণ পরম্পরার ফল। কিন্তু দুঃখের মূল কারণ যেহেতু অবিদ্যা তাই অবিদ্যার বিনাশ হলে দুঃখও নিরুদ্ধ হয়। কারণের ধ্বংসেই কার্যের ধ্বংস হয়। সম্যক জ্ঞানের উদয় হলে অবিদ্যার বিনাশ হয়। অবিদ্যার বিনাশ ও তার ফলে দুঃখের নিরোধ হলে জীব যে অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তার নাম নির্বাণ। দুঃখের নাশের ফলে যেহেতু নির্বাণ লাভ হয় তাই নির্বাণ একটি দুঃখ-বিনির্মুক্ত অবস্থা। অবিদ্যার তিরোধান হলে ষড়ায়তন সংযত হয়। বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ বিনষ্ট হলে অনুভূতি থাকে না। তার ফলে ভোগবাসনা বিলুপ্ত হয় এবং পুনর্জন্ম হয় না। এই ভাবে মানুষ ভবচক্র থেকে মুক্ত হয়। সে ষড়ায়তনকে জয় করে এবং নির্বাণ লাভ করে। নির্বাণ এমন একটি অবস্থা যা দুঃখের অতীত, আনন্দময়, স্থির ও শান্ত।

চতুর্থ আর্যসত্য— মার্গসত্য— চতুর্থ আর্যসত্যে বুদ্ধদেব দুঃখ নিরোধের মার্গ বা পথ নির্দেশ করেছেন। দুঃখ নিরোধের এই পথ আটটি পর্যায়ে বা অঙ্গে বিভক্ত। সেইজন্য এই পথ বা উপায়কে অষ্টাঙ্গিকমার্গ বলা হয়।

(১) **সম্যক দৃষ্টি**— অবিদ্যাই যেহেতু সকল দুঃখের কারণ তাই সর্বপ্রথম যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। জগৎ সম্পর্কে মিথ্যা দৃষ্টিকে অবিদ্যা বলে। সম্যক দৃষ্টির সাহায্যে অবিদ্যা দূরীভূত হলে দুঃখও দূর হয়। 'দৃষ্টি' শব্দের অর্থ বিশ্বাস এবং 'সম্যক' শব্দের অর্থ যথার্থ। চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হলেই সম্যক দৃষ্টি হয়। এই সম্যক জ্ঞান মানুষের নৈতিক সংস্কার সাধন করে।

(২) **সম্যক সংকল্প**— কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই মানুষকে নির্বাণের পথে নিয়ে যায় না। বুদ্ধদেবের মতে সম্যক দৃষ্টি অনুসারে জীবন গঠিত হলেই তা ফলপ্রসূ হয়; অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টির ফলে যদি সম্যক সঙ্কল্প জাগ্রত হয় তবেই তা মানুষকে উন্নত বা মোহমুক্ত করতে পারে। নিরাসক্তি, সর্বজীবে প্রেম, অহিংসা এবং সকলের জন্য শুভকামনার মধ্যে সঙ্কল্প জাগ্রত হয়।

(৩) **সম্যক বাক্**— সঙ্কল্প যদি বাক্য ও কর্মে প্রকাশিত না হয় তাহলে তা ব্যর্থ হবে। অসত্য বাক্য, নির্দয় বাক্য প্রভৃতি বর্জন করা উচিত।

(৪) **সম্যক কর্মান্ত**— সম্যক সঙ্কল্প যেমন মুক্তিকামী ব্যক্তির বাক্য নিয়ন্ত্রণ করবে, সেইরকম তার দ্বারা কর্মও নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। মুক্তিকামী ব্যক্তির কর্মেও সম্যক সঙ্কল্প প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। যিনি নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক তাঁকে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ও অস্তেয় এই ত্রিবিধ কর্মব্রত পালন করতে হয়। এই তিনটি সম্যক কর্ম।

(৫) **সম্যক আজীব**— যাঁর বাক্ ও কর্ম সম্যক সঙ্কল্পের দ্বারা সংযত হয়েছে তিনি সৎপথে জীবিকা নির্বাহ করবেন। নিজের জীবন রক্ষার জন্যও তিনি কোন গর্হিত পথ গ্রহণ করবেন না। এইভাবে বাক্য ও কর্মের সঙ্গে সমগ্র জীবন পরিশুদ্ধ হয়।

(৬) **সম্যক ব্যায়াম**— 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ 'প্রচেষ্টা'। উপরোক্ত সমস্ত ধর্ম অর্জন করলেও অতীত সংস্কারের প্রভাবে নির্বাণকামী ব্যক্তির চিত্তে অশুভ চিন্তার উদয় হতে পারে। সেইজন্য যিনি নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক তিনি সর্বদা যথাশক্তি মন থেকে অশুভ চিন্তাকে দূর করার চেষ্টা করবেন এবং একই সঙ্গে সৎচিন্তার দ্বারা চিত্তকে পূর্ণ রাখার চেষ্টা করবেন। একমাত্র শান্ত ও নির্মলচিত্ত ব্যক্তিই নির্বাণ লাভে অধিকারী।

(৭) **সম্যক স্মৃতি**— বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকাই 'স্মৃতি'। নির্বাণেচ্ছু ব্যক্তিকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে এ জগতের কোন কিছুই নিত্য নয়। এই বোধ বা স্মৃতি যদি সর্বদা জাগ্রত থাকে তাহলে জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি আর আসক্তি থাকে না।

(৮) **সম্যক সমাধি**— উপরোক্ত সাতটি স্তরে নৈতিক পরিশুদ্ধি হলে মুক্তিকামী ব্যক্তি ধ্যানের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করেন। এরই নাম সম্যক সমাধি। সমাধিতে সাধক প্রথমে শান্ত, আনন্দময়, উদাসীন অবস্থায় অবস্থান করেন। পরে সাধক সর্বপ্রকার অনুভূতিবিহীন হয়ে আত্মসমাহিত হন।

বৌদ্ধদর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ আলোচনা করলে বোঝা যায় যে এই সাধন মার্গ যদিও মানুষকে শুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার পথ তাহলেও সাধককে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নৈতিকতা ও দেহ-মনের বিশুদ্ধতা আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। কায়মনোবাক্যের পরিশুদ্ধি ছাড়া আত্মিক পরিশুদ্ধি সম্ভব নয়। এই পরিশুদ্ধির জন্য যা বিশেষভাবে পরিহার করা উচিত তা হল অমিতাচার। দেহ ও মনের অসংযত পরিতৃপ্তি নিয়ে চিত্তের প্রশান্তি ও নির্বাণ লাভ করা যায় না।

বৌদ্ধ নীতিদর্শন পরিণতি লাভ করেছে নির্বাণের ধারণার মধ্যে। কিন্তু নির্বাণ কখনও সমস্ত মানুষের সাধ্য হতে পারে না। নির্বাণ লাভের পথ অতি দুর্গম। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা প্রায় অসাধ্য। তাই বুদ্ধদেব তাঁর নীতিদর্শনে সাধারণ মানুষকে সৎচরিত্র গঠনে উৎসাহিত করেছেন। অহিংসা, সত্যভাষণ, কৃপা, সৎপথে জীবিকা নির্বাহ— ইত্যাদি আদর্শ তিনি প্রচার করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষকেও নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাদের জীবন থেকে নির্বাণ দূরে থাকলেও মানুষ হিসাবে তারা নৈতিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে।

বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক হলেও অন্যান্য আস্তিক দর্শনের মতো এই দর্শনও নির্বাণ বা মোক্ষকে শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছে। মানুষের জীবনের পরমপ্রাপ্তি ভোগের মধ্যে নেই। বুদ্ধদেব দিয়েছেন অমৃতলাভের শিক্ষা। নির্বাণ পরমপদ— নির্বাণ থেকে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। নির্বাণ জীবনের পরম গতি। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বলা হয়েছে 'রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় হলেই নির্বাণ লাভ হয়'। রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটিকে 'রজ' বা 'মল' বলা হয়। তার কারণ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি অশুদ্ধ এবং তার প্রভাবে অন্যবস্তুও অশুদ্ধ হয়। নির্বাণ 'বিরজ' বা 'বিমল' অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি রজ বা মল থেকে মুক্তি। তাই একমাত্র নির্বাণই বিশুদ্ধ।

বৌদ্ধমতে বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট পথে জীব নির্বাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পরম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই নির্বাণকে নৈতিকতার চরম লক্ষ্য বলে উল্লেখ করলেও তিনি সাধারণ মানুষের জন্য শীল বা চরিত্রগঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে একথা সত্য যে অশুদ্ধ ও অনৈতিক পথে কোন মানুষের পক্ষেই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। বরং বলা চলে যে চরিত্রের শুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক পথে মানুষের যাত্রা আরম্ভ হয়। বস্তুত বুদ্ধদেব যে চারটি আর্যসত্যের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবন শীলের অন্তর্গত। শীল কতকগুলি নৈতিক বিধি বা শৃঙ্খলা।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সাধারণ মানুষ যাদের কাছে নির্বাণ একটি দুর্লভ লক্ষ্য তারা এই তিনটি বিধি অনুসরণ করে তাদের জীবনকে শুদ্ধ ও পরিশীলিত করে তুলতে পারে। এই চারিত্রিক শুদ্ধতারও নিজস্ব মূল্য আছে। সত্যবাদিতা, বিদ্বেষহীনতা বা সততা যে কোন মানুষেরই কাম্য হতে পারে। নির্বাণ লাভ না করেও মানুষ নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে যারা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে আগ্রহী অর্থাৎ যারা নির্বাণ প্রার্থী তাদেরও চরিত্রের শুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিকতার পথেই ধর্মলাভ সম্ভব। অনৈতিক পথে ধর্মলাভ হয় না।

শীল

বৌদ্ধ দর্শনে আধ্যাত্মিক পথ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত যার মধ্যে প্রথমটি শীল, দ্বিতীয়টি সমাধি এবং তৃতীয়টি প্রজ্ঞা। শীল বা চরিত্রশুদ্ধি ব্যতীত সমাধি ও প্রজ্ঞা হয় না।

সংযুক্ত নিকায়ে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত পরমশুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নির্বাণ লাভ হয়।